পড়ে আছে সুন্দরের রক্তচিহ্নগুলি

শুভব্রত চক্রবর্তী

কবিতা মাত্রেই একটি প্রতিবাদ। মানুষের অতৃপ্তি নিরন্তর। কখনো বাহ্যিক বা প্রত্যক্ষ, কখনো আন্তরিক অথবা পরোক্ষ। আর সেই অতৃপ্তি থেকেই জন্ম নেয় শিল্প। সেহেতু যে কোনো শিল্প অতৃপ্ত অস্তিত্বেরই প্রতিবাদ। Stephane Mallarme-এর কথায় বলি ক্রাইসিস-ই কবিতার স্রষ্টা। এই ক্রাইসিস ছাড়া কাব্য রচনা অসম্ভব। সমাজের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে, জীবনের বিরুদ্ধে, শিল্পের বিরুদ্ধে, রাজনীতির বিরুদ্ধে এমন কি নিজের বিরুদ্ধেও জমে ওঠা জন্মান্তরের অসন্তোষ কবিকে স্বাভাবিক প্রতিবাদী ক'রে তোলে। তার একাকীত্বের সঙ্গে। তার একঘেয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই-এর বহিঃপ্রকাশই কবিতা। সব শিল্পের ক্ষেত্রে সেই একই রীতি, মূল উৎস। 'যে কোনো শিল্প হবে রক্তদিয়ে ফোটানো গোলাপ।' কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধার থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিল্পের স্বাভাবিক আবেদন অবশ্যই সৌন্দর্যের বিকাশ, তবে যার ঘাত প্রতিঘাতের ক্ষতচিহ্নের ভিতর দিয়ে স্বরূপ নিরূপিত। একটা অন্বেষণ চলে আজীবন। কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নয়, সঠিক নয়, আরও সমগ্রতার দিকে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম কবির ধর্ম। যাঁরা নিছক প্রকৃতি নিয়ে প্রেম নিয়ে বিশুদ্ধ কবিতা লিখতে ভালোবাসেন, যাদের চিন্তা, প্রত্যক্ষ দ্রোহমুখী নয় তাঁদের মধ্যেও দেখি দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। নতুন তাৎপর্যের সন্ধানে উন্মুখ। সেখানেই অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপবিকাশের প্রচেষ্টার বিদ্রোহ। নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। অভ্যন্তরে ক্রমশ রক্তদাগ গভীর হতে থাকে। পাগলের মত ছটফট করতে করতে কবি সহজ সাবলীলতা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন আরও বেশি ঈঙ্গিতময়। Suggestive, বহুমাত্রিক অনুভবে যার বিকাশ আচ্ছন্ন, বিস্তৃত।

আসলে কবিতায় কোনো বিষয়কেই কেবল বিষয়ের প্রেক্ষিতে দেখা প্রায় অসম্ভব। তাতে মিশে থাকে কবির মর্জি বা মেজাজ, মিশে থাকে সমসময়ের আবেদন এবং সময় উত্তীর্ণ চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতা। অন্তত সার্থক কবিতা তাই চায়। বাঙলা কবিতার শুরু থেকেই যদি বিচার করে দেখি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তখনও কবিতা মানেই প্রতিবাদী (বাহ্যিক অথবা আত্মিক) কণ্ঠস্বর, প্রথাবিপরীত উচ্চারণ। অবশ্য পাঠকের মানদণ্ডে কবিতা হয়ে ওঠার দায় নেই কবির। লেখার টেবিলে তিনি সমস্ত দায় এবং তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত এক পৃথক সত্তা। যে অস্তিত্বের ভিতরে বিপন্ন সংবেদে কবি একাকী তবে তাঁর দ্রোহে সত্তা শিল্পকৃতিতে, তাঁর কবিতা যাপনে গতানুগতিককে অস্বীকার করে সবসময় এক নিজস্ব বোধের যাত্রাতেই উন্মুখ। আর সেখানেই কবি আঙ্গিকে, উচ্চারণে, ভাষায়, ভাবনায় স্বতন্ত্র। চর্যাপদের সময় থেকেই আমরা সেই অতৃপ্ত, কাতর, বিরোধী

কণ্ঠের প্রকাশ দেখি। যদিও আধ্যাত্মিক চেতনার উপরেই মূলত যার অধিষ্ঠান। তখনকার সামাজিক অবস্থানেরও উল্লেখ পদগুলির মধ্যে যথেষ্ট। ভুসুকুপাদর রচিত দুটি পংক্তি এইরকম—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভূসুকু অহোরি।।

নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজের শত্রু। কোন ক্ষুধার্তই যাকে ছেড়ে দেবে না। আবার লুইপাদের বিরোধ মায়ার অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে।

কাহারে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিন সাচ ন মিছা।।

কাকে কী প্রশ্নের উত্তর দেব, জলে প্রতিভাত চন্দ্র না সত্য, না মিথ্যা। এই আত্মবিরোধীতা চর্যাপদ থেকে, আমরা লক্ষ্য করি, জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-তেও সমান প্রসারিত। জীবনানন্দ দাশের কবিতার উল্লেখ—

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু—
দণ্ডাজ্ঞান ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপর।
আমরা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

[মনোকিণকা]

অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি লাইন—

ফাটাডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেরে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

[উটপাখী]

এভাবেই কোনো ইজম্ বা মতবাদের মধ্যে না গিয়েও প্রতিবাদের স্বতন্ত্র মুখগুলি দেখি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি আধুনিক কবিদের মধ্যেও এখানে দু-একটি উদাহরণ আবশ্যক। কবিরাজ গোবিন্দদাস রচিত

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢালি করি পীছল
চলতহি আঙ্গুলি চাপি।।

অভিসারে চলেছে রাধা শতেক বিপত্তি পেরিয়ে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে। কিংবা বিদ্যাপতির প্রার্থনায় দেখি নিজের প্রতিই তাঁর বিরক্তি, তার বিরোধ

তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলু
অব মঝু হব কোন কাজে।।

মূল বিষয় আধ্যাত্মিকতা হলেও কবিদের বিপন্ন অন্তর্জগতের আভাস পাই। সেখানে কেবল ধ্যান বা স্তব নেই, আত্মদ্বন্দ্বও রয়েছে। সেই একই প্রতিফলন, ভিন্ন মেজাজে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় দৃশ্যমান

তীরে কি প্রচণ্ড কলবর
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিল বারি?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

[আমি স্বেচ্ছাচারী]

ভারতচন্দ্র থেকে সাম্প্রতিকতম কবিটিও Crisis-এর দর্পণে প্রতিবিম্বিত। অন্নদামঙ্গলে রায়গুণাকর বলছেন 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' এক তীব্র আর্তি, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। পংক্তিটি পাটুনীর ব্যক্তিগত চাহিদায় সীমাবদ্ধ নেই, না দেবীর কাছে প্রার্থনায়। সমস্ত সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে চিরন্তন নৈর্ব্যক্তিক সমগ্রতার আকাঙ্খা।

বাঙলার মানচিত্র ছাড়িয়ে বিদেশী কবিতার ক্ষেত্রেও পরোক্ষ বা প্রতক্ষ্য প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই সেই সম আর্তিতে। D.H. Lawrence থেকে T. S. Eliot-Fridrich Schiller, Goethe থেকে Heine Brecht, Raines Maria Rilke–Moliere Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Verlaine, Stephene Mallarme, Guillaure Apollinairs অথবা Antonio Machado, Federico Garcia Lorca সকলের লেখাতেই প্রতিবাদের ছোঁয়া থাকে, প্রথাতিক্ত বিরোধীতা থাকে। বেশি উদাহরণ দিয়ে লেখাটিকে দীর্ঘ না করে সামান্য কয়েকজনের কবিতার লাইন উদ্ধার করবো আমার বক্তব্যের সমর্থনে। T. S. ELIOT-এর দুটি পংক্তি এইরকম—

"I Never know what you are thinking Think."
I think we are in rats' alley
where the dead man lost their bones.

—The Waste Land

The endless altered people came,
Washing at their identify

Now, helpless in the hollow of
An Unarmorial age,

–An Arundel Tomb (Philip Larkin)

তবে তাই হোক, আমি শুধু এই ধরিত্রীর এক
জাতক, জন্মেছিলাম ভালোবেসে দুঃখ পাব বলে।

—আপন স্বদেশ (হ্যোণ্ডারলীন)
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরণ চঞ্চল
কখন খেয়াল হ'লো গুণ-টানা মাঝিদের টান
থেমে গেছে—হতভাগ্য, প'ড়ে মত্ত বর্বর-দঙ্গলে
রক্তাক্ত খুঁটির গায়ে বিদ্ধ তারা, নগ্ন, লম্বমান।

—মাতাল তরণী : আর্তুর র‍্যাঁবো
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অঙ্কুশে
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয় পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ

—স্তেফান্ মালার্মে : উৎকণ্ঠা
অনুবাদ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

উপরে যাদের কাব্যাংশের উদ্ধার রাখলাম তারা কেউ প্রচলিত অর্থে প্রতিবাদী কবি নন (আবার না-ই বা বলি কি করে? তাঁদের কবিতা তো কলঙ্কিত সমাজেরই ফসল। অপূর্ব ভীষণে।

ঠিক এর বিপরীত ভাবনার কবিতা ও আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই সরাসরি সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মুখর। আন্দোলনমুখী ভিন্নতর উচ্চারণে। কখনো যে আন্দোলন অতৃপ্তিতে প্রতক্ষ্য উঠে এসেছে, কখনো শিল্পের স্বভূমিতে প্রকট। কবিতার প্রয়োজনে মুখরিত। সারা ইউরোপে এরকম অনেক আন্দোলন হয়েছে। Impressionism, Fanveism, Symbolism, Wbism, Dadaism, Surrealism প্রভৃতি। কবিতার উপরে আন্দোলনগুলিই এখানে উল্লেখিত হবে। Symbolist কবি মালার্মে, বোদলেয়ার; Dadaist কবি Hugo Ball, Andre Broton, Paul Eluard, Aragon । ব্রেতোঁ, এল্যুমার, আরগঁ ফ্রেঞ্চ কবিরা পরবর্তীকালে স্যুরিলিস্ট হয়ে গেছিলেন। সিম্বলিস্ট কবিতার মতো স্যুরিলিস্ট কবিতার আন্দোলন ছিল শিল্পের স্বার্থে, কবিতার কারণে। আমি আগেই মালার্মের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছি, র‍্যাঁবোর দিয়েছি এখানে বোদলেয়ারের কবিতার উল্লেখ রাখলাম—

ও যন্ত্রণা, ওগো দুঃখ! শিখে নাও প্রাজ্ঞাতার শিক্ষা।
সেই সন্ধ্যা এসে গেছে; এইবার তুমি হয় জ্ঞানী
শহরে ক্রমশ ব্যাপ্ত ধোঁয়াশার বিষাদের টিকা;

—ধ্যান

অনুবাদ : দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তাঁর সৌন্দর্য বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করে না; শিল্পকেই সৌন্দর্যের কাছে যেতে হয়। যাকে আমরা কুৎসিত বলি শিল্পীত মননের সাহায্যে সুন্দর বেরিয়ে আসতে পারে, বেরিয়ে আসতে পারে আধ্যাত্মিক অভিঘাত।

দাদাইজ্‌ম-এর কবিরা কিন্তু সরাসরি সমাজের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় Zurich-এ হুগো ব্যল মানুষের অহেতুক ও অকারণ মৃত্যুতে সরব হয়ে উঠলেন। ক্যাবারে ভল্টেয়ারে গড়ে উঠল এক নতুন আন্দোলন। হুগো বললেন—The age of madnces's সুতরাং সেই শিল্প বা সাহিত্য আমরা খুঁজছি যা শুরুর সঙ্গে যুক্ত, প্রাথমিক, সুস্থ করে তুলতে পারবে সময়ের পাগলামোকে। যা একই সাথে দাঁড়াবে সম্পূর্ণতা ও শূন্যতার হয়ে। ইতিবাচক ও নেতিবাচকের এক অসম্ভব সংমিশ্রণ। রেনেসাঁর পর আর কোনো সাহিত্য আন্দোলনই বোধহয় সোজাসুজি সমাজকে এভাবে ধাক্কা দিতে পারে নি। Tristan Tzara মধ্যদিয়ে যা পরবর্তী সময়ে জার্মানি হয়ে প্যারিসে এসে পৌঁছায়। বাচ্চর প্রথম শব্দের অভিজ্ঞতা থেকে দুগো ব্যল খুঁজে পেলেন তাঁর উচ্চারণ—

Gadji beri bimba
Gtandridi laudi Lonni cadori
Gadjama bim beri glassala

এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য 'In these phonetic poems we totally renounce the language that yournalism has abused...we must reture to the innermost alchemy of the word'. তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে দাদাইজম্‌ যত শক্তি নিয়ে এসেছিল তা নিঃশেষ হতে বেশি সময় লাগেনি। 1916 থেকে 1920 সালের প্রথম পর্যন্ত, চার বছরও নয়। কারণ এসময়ের কবি, শিল্পীরা সমাজের প্রতি যতটা বিদ্রোহী ছিলেন, কাব্য বা শিল্পের প্রতি ততটা আগ্রহী ছিল না। তবুও দাদা শিল্পের আন্দোলন পরবর্তী কালে কিছুটা ছাপ ফেললেও কাব্য আন্দোলন ধারাবাহিক সাহিত্যে কোনো বিশেষ চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। আমি আর উদাহরণ দিয়ে লেখাটিকে অহেতুক পাঠবিচ্ছিন্ন করতে চাই না। আন্দ্রে ব্রেতোঁ এবং ট্রিস্টান জারা চেষ্টা করেছিলেন দাদা আন্দোলনকে যুক্তিগ্রাহ্যতায় দাঁড় করাতে। Manifesto-র সাহায্যে।

আর একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন সারা পৃথিবীর সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছিল প্রায় দাদাইজম-এর সমসময়। Karl Marx-এর চিন্তাধারায় প্রভাবিত

বাম-আন্দোলন বা Communist আন্দোলন। আমি আন্দোলনটির তত্ত্ব বা তথ্য আলোচনা করছি না, এখানে যা আমার কাজও নয়। এটুকু বলবো সমস্ত সাহিত্যের অনেকখানি অংশ সমভোগবাদ-এ গ্রাস ক'রে নিল। অনেক কবিই এই সাম্যবাদে অনুপ্রাণিত। Mayakovsky, Pushkhin—এমন কি প্যারিসের কবিদের উপরেও এই আন্দোলনের কিছু প্রভাব অনস্বীকার্য। আমি এই প্রবন্ধে বাম সাহিত্যের বিশ্ব প্রেক্ষিত না দেখিয়ে বাঙলা কবিতায় তার ভূমিকাটি দেখাবো। সমাজের প্রতি কবিতায় বিক্ষোভ দেখানোর এরকম হাতিয়ার বাঙলা কবিরা সমাদরে গ্রহণ করলেন। বাম ভাবনায় ভেসে গেলো চল্লিশ দশকের বাঙালি কবিদের কবিতা। তখন কে নয়? সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ দাস প্রায় সকলেই বাম চেতনায় দীক্ষিত। দেশকে সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করার দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজেদের ভাষায়। দুঃখী মানুষের, প্রতারিত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন কবিরা। কবিতার মধ্যে আর শিল্পের আড়াল রইলো না, সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন প্রশাসনের দিকে, সমাজের দিকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন—

হা-ঘরে আমরা, মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর;
ফলে নেই লোভ; তোমার গোলায় তুলি ফসল।

[প্রস্তাব : ১৯৪০]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অংশ ঃ—

চারিদিকে আদিম পাথর পড়ে আছে
মানুষের রক্তমাখা

[আদিম পাথর]

চারটি পংক্তি অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা থেকে উদ্ধার করলাম

নীলের কাঙাল তুমি?
নদী দেখো, সাঁতারে যেও না;
ওর বুকে কমপক্ষে
গোটা কুড়ি নৌকাডুবি আছে।

[নৌকাডুবি]

গত শতাব্দী মূলত চল্লিশ দশক থেকে বাঙলা কবিতায় যে বামপন্থী আন্দোলন কবিতাকে অন্য মাত্রা দিল তা ছড়িয়ে পড়লো পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকেও। তবে কবিতা শিল্পের সংজ্ঞা হারিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠলো স্লোগান ধর্মী, রাজনীতির ইশতেহার।

বামপন্থী দর্শন ছাড়াও বাঙলা কাব্যে অন্য প্রেক্ষিতের কবিতা আন্দোলন যে একেবারেই হয় নি, তা কিন্তু নয়। ষাট দশক জুড়ে অনেক আন্দোলনই হয়েছে। Beat মুভমেন্টের পুরোধা Allen Ginsberg-এর কলকাতায় আসা এবং তাঁর কাব্যচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, সুভাষ ঘোষাল, দেবী রায় এবং আরও অনেকেই গড়ে তুললেন হাংরি আন্দোলন। বীটদের মতন ক্ষুধার্থরাও কাব্যভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। আলোক সরকারের নেতৃত্বে মালার্মে প্রভাবিত গড়ে উঠলো বিশুদ্ধ আন্দোলন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়রা শুরু করলেন ধ্বংসকালীন আন্দোলন। হয়েছিল শ্রুতি আন্দোলন, পুষ্কার দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল প্রভৃতি কবিদের নিয়ে। একটা কথা বলা প্রয়োজন অবশ্যই এখানে কাব্যে প্রতিবাদ নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারত। আরও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ সম্ভব। কিন্তু রচনাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে, যা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পক্ষে ছাপানো কষ্টসাধ্য। যার জন্যে আমি ক্ষমাপার্থী। আমি প্রতিবাদের মূল জায়গাগুলিই ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। আর একটা কথা আমি উদাহরণ বা কবিদের নামগুলি যে ভাবে পেয়েছি সে ভাবেই তুলে দিয়েছি। হ্যাঁ অলোচনাটা সত্যি অসম্পূর্ণ যেমন বীট কবিদের নিয়ে তাঁদের দ্রোহ নিয়ে, গীন্সবার্গকে নিয়ে কিছুটা বেশি তথ্য দেওয়া যেতে পারতো, অনেক কথাই বলা যেতে পারে, আমি জানি। Anti-Poetry বা 'না কবিতা' নিয়েও হয়ত বলা উচিৎ ছিল। কারণ 'না কবিতা'ও কবিতার বিরুদ্ধে একটি কবিতা আন্দোলন। যাই হোক, যে ভাবনা থেকে লেখাটি শুরু করেছিলাম শেষ করি সেই প্রসঙ্গ টেনে। শিল্পের স্বাভাবিক শর্তই হলো সৌন্দর্যের অন্বেষণ। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই। শিল্পের দায় সেখানেই সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করা, সৌন্দর্যের কাছে যাওয়া—তা যত কুৎসিত বিষয়ই হোক না কেন। তাই দিনগত রক্তচিহ্নের ভিতরেই কবিরা সৌন্দর্যের সন্ধানে ফেরেন।